মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল্যায়ন

মিশনারীদের দান

ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের একটা বিশিষ্ট অবদান রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মিশনারিগণ ধর্মপ্রচার করতে এসে কেন শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন, তাও জানা দরকার। ধর্মান্তরিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। তাই স্কুল খুলতে হল। খ্রীষ্টানদের জন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল ছাপানো প্রয়োজন, তাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। ভারতীয় ভাষা শিখতে হলে ভাষার ব্যাকরণ জানা দরকার। আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ তখনও রচিত হয় নি— দেখা যায়, বাংলা ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ মিশনারীরাই প্রথম লিখেছেন। দেশীয় খ্রীষ্টানগণ যাতে কাজকর্ম পায়, সেজন্য কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থাও মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার একটি অঙ্গ ছিল। ফলে, কোথাও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তার শুরু হল, কোথাও শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা চলতে লাগল। শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার মিশনারী প্রচেষ্টায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

মিশনারীরা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার কার্যপদ্ধতি গতানুগতিক দেশীয় পাঠশালার অনুরূপ ছিল না। আমরা স্কুল বলতে বর্তমানে যা বুঝি তার প্রথম সূচনা মিশনারী প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির মধ্যে দেখা যায়। যদিও খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়াই ছিল স্কুলগুলির প্রধান লক্ষ্য, তবুও এখানে ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ানো হত। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হত। কাজকর্মের একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। মিশনারীরাই এদেশে স্কুলপাঠ্য বই ছাপিয়ে প্রকাশ করেন ও স্কুলে তার প্রচলন করেন। স্কুল বসবার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ ছিল। প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ও নারীশিক্ষার প্রবর্তনে মিশনারীদের দান স্মরণীয়। শিক্ষকের সংখ্যাও একের অধিক হত। একজন শিক্ষকের অধীনে একটি শ্রেণী পরিচালিত হত। মিশনারী স্কুলগুলিতে যে শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিচালনব্যবস্থা ছিল, পরবর্তীকালে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়। এই মিশনারী স্কুলের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে নতুন শিক্ষাধারার প্রথম প্রবর্তন হল।

বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনায় মিশনারীদের দান

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্যের কোন সুসংবদ্ধ সংহত রূপ ছিল না। গদ্য ছিল দলিল, দস্তাবেজ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চিঠিপত্র লেখার ভাষা। পর্তুগীজ পাদরীদের আগমনের পর থেকেই বাংলা গদ্যের ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের একটা প্রধান অন্তরায় ছিল ভাষাগত অসুবিধা। দেশীয় ভাষায় ধর্মপ্রচার ও দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদের জন্য তাঁরা গদ্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। উদ্দেশ্য যাই থাকুক, এর ফলে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ উপকৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

ভূষণার এক জমিদারের পুত্রকে পর্তুগীজ পাদরীরা মগ দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। তিনি দোম্ আন্তেনিও নাম গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে "ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদ" নামে একখানা বাংলা বই রচনা করেন। এর প্রায় একশ' বছর বাদে (১৭৪৩ খ্রীঃ) মনোএলদা আসূমসুপসাম নামে একখানি বাংলা ব্যাকরণ ও 'কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ' নামে একখানি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা গদ্যরচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে শ্রীরামপুরের মিশনারীত্রয়ের। ১৮০০ খ্রীঃ

মিশনারিগণ শ্রীরামপুরে প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকে কেরী বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই প্রেস থেকেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেরী সাহেব নিজে ইতিহাসমালা ও কথোপকথন রচনা করেন। অবশ্য বর্তমানে অনেকে মনে করেন, এইগুলি তিনি সঙ্কলন করেন, রচনা করেন নি।

কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাচ্যভাষা বিভাগের প্রধান থাকা কালে তাঁর উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ বিভাগের শিক্ষক ও মুন্সিগণ বহু বাংলা পুস্তক রচনা করেন। রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ও 'লিপিমালা' রচনা করে বাংলা গদ্যকে সহজ রূপ দেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলী', 'হিতোপদেশ', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করে ভাষার সাধু রীতি ও কথ্য রীতির প্রবর্তন করেন। রাজীবলোচনের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' এ যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা।

সংবাদপত্রের ইতিহাসে মিশনারীদের দান স্মরণীয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ প্রথমে "দিগ্‌দর্শন" নামে মাসিক পত্র বার করেন। এরপর ১৮১৮ খ্রীঃ "সমাচারদর্পণ" প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সমালোচনা করা হত। এর প্রতিবাদে রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেন।

মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্মপ্রচার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা

শ্রীরামপুর মিশন : ১৮০০ খ্রীঃ মিশন সংগঠিত হবার পর থেকে মিশন শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগী হয়। ১৮১২ খ্রীঃ মধ্যে অন্ততঃ আটটি বিদ্যালয় মিশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৮১৩ খ্রীঃ পর মিশনারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করা শুরু করে। নতুন সনদ আইনে মিশনারীরা কোম্পানীর এলাকায় তাদের কার্যকলাপ বিস্তৃত করবার সুযোগ পায়। শ্রীরামপুর মিশনের কার্যক্ষেত্র এলাহাবাদ থেকে আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ বিভিন্ন মিশন ১৮০ টির বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে, তার ১১১টি বিদ্যালয় শ্রীরামপুর মিশন পরিচালনা করত।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি : রেভারেণ্ড মে—লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভরেণ্ড মে ১৮১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে বেল পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেবার জন্য চুঁচুড়ায় নিজ বসতবাড়ীতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা খোলেন। ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেলে স্থানীয় ইংরেজ কমিশনার গর্ডন ফোর্বস দুর্গের মধ্যে একটি বড় ঘর পাঠশালার জন্য ছেড়ে দেন। অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র হল ৯২ জন। এক বছরের মধ্যে মে সাহেব ১৬ টি পাঠশালা খোলেন। ছাত্র হল মোট ৯৫১ জন। ১৮১৫ খ্রীঃ ফোর্বস সাহেব উদ্যোগী হয়ে মে সাহেবের পাঠশালাগুলির জন্য ৬০০ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করান। পরের বছর পাঠশালার সংখ্যা বাড়ল, ছাত্রসংখ্যাও বেড়ে হল ২১৩৬ জন। কাজের প্রসার হওয়ায় সরকারী সাহায্য বেড়ে ৮০০ টাকা হল। ১৮১৮ খ্রীঃ মে সাহেব মারা যান। তখন পাঠশালার সংখ্যা ৩৬টি। হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা হয় তিন হাজার। ১৮২৪ খ্রীঃ *General Committee of Public Instruction (G.C.P.I.)* সরকারের পক্ষ থেকে মে সাহেবের সব পাঠশালার ভার গ্রহণ করে। মে সাহেব শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার জন্য একটি নর্মাল স্কুল খোলেন। স্কুলটি এক বছর বাদে উঠে যায়। ১৮৩৬ খ্রীঃ মে সাহেব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

বর্ধমানের পাঠশালা ও চার্চ মিশনারী সোসাইটি: ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট বর্ধমানে ১৮১৮ খ্রীঃ একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। স্টুয়ার্ট নিজে ভাল বাংলা জানতেন। এক বছরের মধ্যে স্টুয়ার্ট দশটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। চার্চ মিশনারী সোসাইটির কলকাতা শাখা পরে এই বিদ্যালয়গুলির ভার নেয়। উপযুক্ত ছাত্রদের ইংরেজী শেখাবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইংরেজী স্কুল খোলা হয়। ছাত্ররা ভাল করে বাংলা শিখলে পরে উপযুক্ত ছাত্রকে ইংরেজী শেখানো হত। সব কয়টি পাঠশালার প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা ইংরেজী শেখার জন্য কেন্দ্রীয় স্কুলে একত্রিত হত।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি বাংলাদেশের খুলনা ও নদীয়া এবং বাংলার বাইরে বেনারস, আগ্রা, মীরাট, আজমীর প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করে। দক্ষিণ ভারতে এই সোসাইটি বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

মিশনারীদের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

'১৮১৪ খ্রীঃ থেকে পরবর্তী আট বছর ১৮১৩ সালের সনদ আইনের নির্দেশমত বাংল দেশে শিক্ষাবিস্তারের কোন চেষ্টাই কোম্পানীর পক্ষ থেকে করা হয়নি। সরকারী এই নিশ্চেষ্টতা যুগে মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যমে বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

ব্যাপটিস্ট মিশনারিগণ শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁদের ছাপাখা থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভাষার স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করা হয়। ছাপা বই বাজারে সুল হওয়ায় শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়। **১৮১৮ খ্রীঃ ২৩ শে মে শ্রীরামপুর থেকে প্রথ বাংলা সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়। এই বছরই ব্যাপটিস্ট মিশনারি ভারতীয় খ্রীষ্টান অধিষ্ঠিত সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতি করেন। দিনেমার সরকারের এক সনদের বলে এই কলেজ থেকে ছাত্রদের তাঁরা ডি দিতে শুরু করেন। এই কলেজই ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী কলেজ।** লণ্ডন মিশন সোসাইটির রেভারেণ্ড মে ১৮১৪-১৮ খ্রীঃ মধ্যে চুঁচুড়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৯ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, হিন্দু মুসলিম উ শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা করত। সরকার থেকে এই স্কুলগু জন্য প্রথমে মাসিক ৬০০ টাকা ও পরে ১,৮০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। রেঃ মৃত্যুর পর পিয়ার্সন ও হার্লি এই স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা বা দেশের কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে ও দক্ষিণ ভারতে বা স্কুল স্থাপন করেছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে ১০টি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ছাত্রস ছিল প্রায় এক হাজার। শিবপুরে ১৮২০ খ্রীঃ বিশপ্‌স্ কলেজ নামে দ্বিতীয় মিশনারী ব স্থাপিত হয়।

ডাফের মতবাদ

স্কট মিশনারী চার্চের শিক্ষাবিদ্ পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮২০ খ্রীঃ এদেশে আসব মিশনারিগণ নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে মিশনারী শিক্ষাপ্রয়াস নীতিগ এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ডাফ এদেশের মিশনারীদের কার্যপদ্ধতি দেখে মোটেই খুশ পারেন নি। প্রাথমিক স্কুলসমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানতঃ অনাথ বা স

নিম্নশ্রেণীর লোকরাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হত। ডাফের মত গোঁড়া পাদ্রীর এতে খুশী হবার কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও বাইবেলের দ্বারাই ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন, সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসার করতে হবে এবং মিশনারীদের সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি চুঁইয়ে পড়া নীতিতে *(downward filteration theory)* বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মনোভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৮৩০ খ্রীঃ তিনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান 'স্কটিশ চার্চ কলেজ' নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, বাইবেল এখানে ছাত্রদের 'অবশ্যপাঠ্য' তালিকাভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। বাংলা দেশের এই কলেজেই প্রথমে *Political Economics* পড়ানো শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেশী ছিল যে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির প্রশংসা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়।

বোম্বাই

মিশনারী প্রচেষ্টা এই সময়ে শুধু বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮২২ খ্রীঃ স্কট মিশনারিগণ কাথিয়াড়ে ইংরেজী ও ভার্নাকুলার স্কুল স্থাপন করেন। ডঃ ডাফ বাংলা দেশে যে পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেছিলেন, স্কট মিশনারী ডঃ উইলসন বোম্বাই প্রদেশে সেভাবে কাজ শুরু করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি বোম্বাই শহরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিন বছর বাদে ডাফের কলেজের আদর্শে তিনি ছেলেদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, বর্তমান বোম্বাই এর 'উইলসন কলেজ'টি এই স্কুলেরই পরিবর্তিত রূপ।

আমেরিকান মিশনারী সোসাইটি উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই বোম্বাই অঞ্চলে কাজ করছিল। এদের উদ্যোগে যথাক্রমে ১৮১৫ খ্রীঃ ও ১৮১৮ খ্রীঃ ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটি নীতিশিক্ষামূলক স্কুলপাঠ্য বই ছেপে প্রচার করতে থাকে। এই সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ একটি স্কুল স্থাপন করে। এদের কর্মক্ষেত্র পুণা, থানা, বেসিন প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

মাদ্রাজ

সনদ আইনের 'শিক্ষাধারা' গৃহীত হবার বহুপূর্ব থেকেই মাদ্রাজে মিশনারিগণ বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিনেমার ও লণ্ডন স্কুল সোসাইটির কাজ খুব ভালভাবে চলছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ ডাফ নয়টি স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৮৩ জন। ১৮১৯ খ্রীঃ ওয়েল্‌স্ মিশনারী সোসাইটি কাজ শুরু করে। এই সোসাইটি মাদ্রাজ শহরে দুটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে। দুটি স্কুলের একটি বর্তমানে মাদ্রাজে 'রায়পেট কলেজ' নামে পরিচিত। ১৮৩৫ খ্রীঃ হিসেবে দেখা যায়, চার্চ সোসাইটি ১০৭টি স্কুল পরিচালনা করেছে এবং এই স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ২২,৮৮২ জন।

মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮৩৫-৫৪)

১৮৩৩ খ্রীঃ নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারিগণই ভারতে

খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, ১৮৩৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মিশনারিদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। এই যুগকে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। যেসব মিশনারী সম্প্রদায় ভারতকে কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়েছিল, তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে জার্মান ও আমেরিকানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজ মিশনারীদের পক্ষেও এই যুগ সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়েই মিশনারী প্রচেষ্টায় ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হল— মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজ (১৮৩৭), নাগপুর হিস্‌লপ কলেজ (১৮৪৪), মসলিপট্টম্ নোবেল কলেজ (১৮৪১), আগ্রা সেন্ট জোসেফ কলেজ (১৮৫২)। এই সব কলেজে অখ্রীষ্টান ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাই বেশী ছিল। কলেজ ছাড়াও সারা দেশব্যাপী মিশনারীরা বহু ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় নারীশিক্ষা প্রবর্তন

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনও মিশনারিগণ অনুভব করেন। এদেশে নারীশিক্ষার সূচনা মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। রেভারেণ্ড মে চুঁচুঁড়ায় (১৮১৮) ও কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে (১৮১৯) একটি করে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। মিশনারীদের পরিচালনায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ৭টি মেয়েদের স্কুল ছিল। মিশনারীদের বিশ্বাস ছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোকে ভারতীয়দের মধ্যে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে যাবে এবং দলে দলে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। ভারতীয়রা মিশন স্কুলে যোগ দিল, ইংরেজীও শিখল, কিন্তু খ্রীষ্টান হল না। (বিস্তৃত আলোচনা পরে)

ফলশ্রুতি

ভারতে আধুনিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক মিশনারীরা। আধুনিক যুগের শুরু থেকে মিশনারীরা যে শিক্ষাবিস্তারে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, আজও তা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা শিক্ষার দিক থেকে মিশনারীদের কাছে বহুভাবে ঋণী।

ধর্মপ্রচারের অতি উৎসাহের ফলে স্থানে স্থানে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সাময়িক ও স্থানীয় জটিলতার উর্ধ্বে তাঁদের নিরলস শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টার ফলে আজও ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মিশনারি প্রচেষ্টারই শুভ ফল। মিশনারিগণ তাঁদের কার্যক্ষেত্র পরিবর্তিত করেছেন; তবুও দেখা যায়, ১৯৩৭-৩৮ খ্রীঃ মিশনারী পরিচালনায় সারা ভারতে ১৪,৩৪১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২,১৮,২০০ জন। এর জন্য ব্যয় হত মোট ৩,৮২,০১,২৪১ টাকা।